4th Semester

CC- VII (History of Mughal India)

Unit 3

Trade, Commerce and Monetary System - routes of trade, Commodity pattern, internal transaction- overseas trade and commodity patterns-markets and monetary system

(NB)

ইরফান হাবিব– মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশর্স।

অনিরুদ্ধ রায়– মুঘল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস, কে পি বাগচী।

Satish Chandra- Medieval India, From Sultanat to the Mughals, Part 2, Har-Anand Publications Pvt. Ltd.

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘলদের আগমনের পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য ব্যাবস্থা ছিল। কিন্তু মুঘল যুগে স্থায়ী ও স্থিতিশীল প্রশাসনের ফলে বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রসার হয়েছিল। যার ফলে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে গতি বৃদ্ধি হয়েছিল। Fryer–এর বর্ণনা অনুযায়ী সেই সময় সুরাট একটি ব্যাস্ত ও জনবহুল নগরী ছিল। শুধু সুরাটি নয় বরং আরো কিছু নগরের উলেখ্য পাওয়া যায় এই সময়, যেমণ– লাহোর, দিল্লি, ঢাকা। বাণিজ্যে জন্যই এই নগরে সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছিল।

অভ্যন্তরীন বাণিজ্যঃ

পণ্য সামগ্রী– এই সময়ে গ্রামীন ও নগরের বাজারে যে সকল পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হত তা হলো– খাদ্য দ্রব্য, লবন, মরিচ ও মশলা, ধাতুর সামগ্রী, দামী ও আধা দামী অলঙ্কার, পোষাক, বিলাস বহুল পণ্য ও আসবাব এবং আফিম।

বাণিজ্যের মাধ্যম–

অভ্যন্তরীন বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সেই সময় গুরেত্বপূর্ণ শেণী ছিল – বানজারা, যারা ছিল উপজাতিক গষ্ঠী ও যাযাবর জীবণ জাপণ করতো।যাযাবর হওয়ার ফলে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বাণিজ্য করতে পারতো। বানজারারা খাদ্য দ্রব্য, লবন, ডাল ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে গিয়ে বড়ো বণিকদের তা বিক্রি করতো। এছাড়াও দামী কাপড়, আসবাব পত্র উঠ বা ঘোড়ার গাড়িতে করে বনজারাদের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হতো। অনেক সময়ে নদী পথের মাধ্যমেও পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হতো। সাধারণত, জল পথের মাধ্যমে দামী ও ভারী সামগ্রী স্থানান্তরীত করা হতো। যার জন্য করোমণ্ডলের ও

দাক্ষিণাত্যের অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এছাড়ও লাহোর, কাশ্মির হস্তশিল্পের জণ্য প্রসিদ্ধ ছিল। আগ্রা ও বুরহানপুর উত্তোর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। বাংলার রেশম শিল্প, গুজরাটের কার্পাস ও খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সেই সময় বাণিজ্য প্রসারের ও গতি বৃদ্ধির জন্য রাস্তাঘাটের উন্নতি ও সুরক্ষিত করা হয়েছিল। প্রতি ৮–১০ মাইল অন্তর সরাইখানার ব্যাবস্থ করা হয়ে। Travernier মতে ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্য ব্যাবস্থার সাথে ফ্রান্স ও ইতালির তুলনা করা যায়। উপমহাদেশের বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি ও সুরক্ষিত করার জন্য হুন্ডি ব্যাবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যাবস্থার মাধ্যমে বণিকরা ধারের মাধ্যমে বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারতেন। এই ব্যাবস্থা বিমার দ্বারা সুরক্ষিত করা হত এবং তার উপর সুদ ধার্য করা হতো, যা দূরত্ব ও যানবাহনের মাধ্যমের উপর নির্ভর করতো। নির্দিষ্ঠ স্থানে সামগ্রী পৌছনর পর নগদের মাধ্যমে বিনিময় করা যেতো পণ্য গুলি। এই সময় বিরজি বোহরার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি একজন প্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়েগায়ে তাঁর সংস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যঃ

রপ্তানি– রেশ্ম, কার্পাস, চিনি, আফিম, দামী আসবাবপত্র, মরিচ, মশলা।

আমদানি– ধাতু, সুগন্ধী, ঘোড়া।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্তুগীজরাই শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেরই নয় বরং এসিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। আরবদের পরিবর্তে তারাই ক্রমশই বাণিজ্য পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যার ফলে উপমহাদেশের বণিকদের সাথে পর্তুগীজদের একটা সহাবস্থান তৈরী হয়েছিল। পর্তুগীজরা cartaz পদ্ধতি শুরু করেছিল, যার ফলে তাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।কিন্তু তা সত্তেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল। ভারতের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ইউরোপীয় দেশ গুলিতে ছিল এবং বাণিজ্যের পরিকাঠাম থাকার জন্য সেই সময় বাণিজ্যের প্রসার ঘতেছিল। যদিও সপ্তদশ শতকের থেকে ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচ কম্পানিগুলিও বাণিজ্যে যুক্ত হয়েছিল। এছাড়াও সেই সময়ের স্থায়ই প্রশাসনের ফলেও বাণিজ্যে গতি এসেছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যে কম্পানিগুলির গুরুত্ব–

মরিচ, মশলার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এসিয়া উপমহাদেশের সাথে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছিল। ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসি কম্পানি গুলি আদতে যৌথ সংস্থা ছিল, যা সেই দেশের সরকারের দ্বারা অনুমদিত ছিল এবং তারা একচেটিয়া বাণিজ্য করতে পারতো। যার ফলে এই সংস্থা গুলি তাদের দেশের সরকারের থেকে নৌ বাহিনির সাহায্য পেত। ফলে তাদের বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধা হতো। সপ্তদশ শতাব্বীর শুরুর থেকেই ডাচরা ক্রমশই পর্তুগীজদের স্থান অর্জন করতে থাকে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে। ১৬০৫ সালে ডাচরা পর্তুগীজদের কেন্দ্র দখল করে। ১৬০৬ সালে তারা মাসুলিপট্টামে ও ১৬১৭ তে সুরাটে তাদের কারখানা স্থপণ করে। ১৬১৩ সালে ইংরেজ কম্পানি সুরাটে তাদের কারখানা স্থপণ করে। ১৬১৮ তে জাহাঙ্গীর Thomas Roe কে ফরমান দেন যার ফলে সুরাটে তাদের অবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু ইংরেজরা যেহেতু মরিচ ও মশাল বাণিজ্যে ডাচদের প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারেনি তাই তারা কার্পাস ও নীল বাণিজ্যে যুক্ত হয়ে। এছাড়াও কাশ্মিবাজার থেকে রেশমও রপ্তানি করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। বাণিজ্যের উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকার ফলে ইউরপীয় সংস্থা গুলি বাণীজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েনি। তবে বাণিজ্যের ফলে প্রচুর পরিমানের

সোনা ও রূপ ইউরোপীয় দেশ গুলির থেকে ভারতে রপ্তানি হতে থাকে কারণ ইউরোপীয় বাজারে এমণ খুব কম জিনিস উৎপন্ন হতো যার চাহিদা ভারতীয় বাজারে ছিল। যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতে পক্ষে ছিল। কিন্তু এই বাণিজ্য ভারতীয় এমনকি এসিয়দের দ্বারাও পরিচালিত হতো না, বরং ইউরোপীয় সংস্থা গুলি উপমহাদেশের বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে এখানে শুধু বাণিজ্যেই নয় বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অধিকার স্থাপন করতে স্বচেষ্ঠ হয়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে তার থেকে রাজস্ব আদায় করা তাদের বাণিজ্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত তা সম্ভব হয়েনি। কিন্তু তার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতাকে ব্যবহার করে ইউরোপীয় বাণিজ্যক সংস্থাগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইউরোপীয় সংস্থাগুলি তাদের বাণিজ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য ভারতের অভন্তরীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবসস্থায় হস্তক্ষেপ করেছিল।

মূদ্রা ব্যবস্থা–

আবুল ফজেল ও জাহাঙ্গীরের লেখা থেকে সেই সময়ের মূদ্রা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এছাড়াও সেই সময় কিছু মূদ্রার ওপর ভিত্তি করে গবেষকরা মনে করেন যে মুঘলদের সময় একটি সোনার মূদ্রাকে মহোর বলা হতো যা নয় টাকার সমতুল্য ছিল, ফজালেরে সময়। এছাড়াও সিক্কা বা তামার মূদ্রার উল্লেক্ষ পাওয়া যায়।যেহেতু বাণিজয়ের উন্নতি হয়েছিল তাই মূদ্রা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আকবরের সময়এ ৭৬ টি সরকারি টাকশাল ছিল, যার মধ্যে ৫৯টি তামার মূদ্রা তৈরী হতো। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলে রূপার মূদ্রা তৈরীর টাকশাল ছিল ৭০টি ও তামার ২৪টি। স্থীতিশীল প্রশাসণিক ব্যবস্থার ও পরিকল্পপিত বাণিজ্যিক ব্যবস্থার জন্য মূদ্রার ক্ষেত্রেও বৈচিত্র দেখা যায় মুঘলদের সময়।